ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৪র্থ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪২২

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা: যাপিত জীবন এবং চিন্তার দ্বন্দ্ব

ড. ফজলুল হক সৈকত*

সার-সংক্ষেপ: কবিতার কলাকৌশল প্রয়োগ ও লালনের প্রতি সুধীনের বিশেষ ঝোঁক আমাদের নজরে আসে। তাঁর কবিতায় স্বভাবের প্রণোদনা এবং যৌবনের আত্মচেতনা ও আত্মপ্রতিফলন অত্যন্ত স্পষ্ট। জীবনের ক্রান্তিকাল আর অভিজ্ঞতাও তাঁর লেখালেখির সরল উপাদান হয়েছে। আবেগ আর পরিশ্রমের দারচা ফসল তাঁর অসামান্য সব কবিতা। সুধীনের সাহিত্যসাধনার মূল ভিত্তি ছিল আত্মোপলব্ধি। তাই কবিতার স্বপ্নবাড়িতে তিনি প্রবেশ করেছিলেন প্রবল প্রস্তুতি ও প্রয়োজনীয় মাল-সামানা ও রশদ সাথে নিয়ে। নিজেকে ক্রমাগত অতিক্রমের এক অনিমেষ প্রেরণাকে চেতনায় ধারণ করে তিনি সামাজিক দুঃশাসন এবং সামাজিকের অবোধ্যতা-নির্বোধতাকে সরলপাঠে ও সাহসের সমাচারে তুলে ধরেছেন। কবিতার মায়াবিনী মমতার পরশ ও সাহচর্য থেকে সুধীন যেন কিছুতেই মুক্তি পাননি। অবশ্য তার চেয়ে বড়ো কথা সে অবস্থা থেকে তিনি মুক্তি চাননি। কারণ তিনি প্রতিনিয়ত কবিতার পাশাপাশি নতুন করে রচনা করেছেন, আবিষ্কার করেছেন নিজেকে। এই পথ ছিল তাঁর আত্ম-অনুসন্ধানের পথ। কবি সুধীনের কাজ বহুমুখি হলেও সাধনা ও ধ্যান ছিল বিশুদ্ধ বাণীমাধুরী। বানান-ব্যাকরণ ও উচ্চারণের ভিন্নতায় তিনি অত্যন্ত সতর্ক শিল্পী। অস্পষ্ট ও অনিচ্ছুক ভাবনা-বেদনাকে ছন্দ ও ভাষার নিগড়ে বাঁধতে এবং চিরাচরিত সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে শিল্পের উদার জমিনের গীতল আহ্বানে সাড়া দেবার প্রত্যক্ষ প্রত্যয়ের বিচারে বাংলা কবিতায় সুধীন্দ্রনাথ দত্তের শূন্যস্থান পূরণ করা, বোধকরি, খুব সহজ নয়। সৃজনকর্ম এবং ব্যক্তিজীবনের প্রতিটি পর্বে ও বাঁকে এই মানুষটি 'কবি' শব্দের সকল সামর্থ্য ও শক্তিকে সফলভাবে ধারণ করতে পেরেছিলেন। তাঁর কবিতায় দুরূহতা (বিশেষত নতুন ও অপ্রচলিত শব্দের প্রয়োগে) পাঠকের চোখে পড়ে; তবে সে কঠিনতা অল্প-আয়াসে অতিক্রম করাও অসম্ভব নয়। আমরা সহজেই অনুধাবন করতে পারি বাংলা কবিতাকে সুধীন দান করেছেন শ্রবণসুভগ সংহতি ও আভিজাত্য। সমাজের সত্য পাঠ অনুসন্ধান ও পরিবেশন, কল্পনা ও প্রেমানুভূতির উপস্থাপনাসমেত তিনি পাঠকের কাছে যথাসম্ভব হাজির থেকেছেন অভিজাত শিল্পী ও সামাজিকের দায় কাঁধে নিয়ে; সেই ঋণ আমরা কী করে শোধ করি!

বিশ শতকে বুদ্ধির দীপ্তি কিংবা প্রতিভার বিশেষ আবেশে বাংলা সাহিত্যকে যাঁরা অগ্রসরতার পথে পরিচালিত করতে সহায়তা করেছেন, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (জন্ম: ৩০ অক্টোবর ১৯০১; মৃত্যু: ২৫ জুন ১৯৬০) তাঁদের মধ্যে অবশ্য-বিবেচ্য ব্যক্তিত্ব। বাংলা কবিতায় 'ধ্রুপদী রীতির প্রবর্তক' হিশেবে খ্যাত তিনি। (প্রসঙ্গত বলে রাখা যেতে পারে, 'ক্লাসিকাল' অর্থে 'ধ্রুপদী' শব্দটি তাঁরই উদ্ভাবনা)। তবে কোনো রকম দ্বিধা না রেখেই বলা যায়— তাঁর কবিতায় রোমান্টিকতার ছাপ অত্যন্ত প্রবল। ব্যক্তিগত ও ঐতিহাসিক যে সকল কারণে কবির কলম কাজ করে সুধীনের ধীশক্তিও কলমের কালির পথ ধরে ওই একই প্রয়োজনে নিয়োজিত ছিল। সামাজিকভাবে প্রায় নিষ্ফল কবিতাকর্মে, পৃথিবীর আরও অনেক নিরীহ-আসীন-কৌতূহলী-উদাসীন কিংবা উৎসুক ও কর্মিষ্ঠ কবির মতোই, সুধীন্দ্রনাথের নিবিড় আত্মনিয়োগ এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। তাঁর শীতল ও নিরঞ্জন কাব্যসাধনা আমাদেরকে

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

অনুপ্রাণিত করে সর্বদা। নানান বিদ্যায় বিদ্বান এবং বহুভাষাবিদ এই পণ্ডিত ও মনীষী তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। এবং তথ্য ও তত্ত্বে আসক্ত মানুষ হিশেবে তিনি সমকালে ও উত্তরকালে প্রশংসিত হয়েছেন। গার্হস্থ্য ধর্মপালনে, সামাজিক আচারে কিংবা পঠন ও আলাপনে তাঁর আগ্রহ ও সংশিষ্টতা ছিল একরকম ঈর্ষণীয়। ব্যক্তিগত কিংবা সামাজিক প্রতিষ্ঠার মোহ সুধীনকে কখনো আঁকড়ে ধরেনি; পিতার উত্তরসূরি এই দেশহিতৈষী সমাজ সেবায়ও একসময় আগ্রহ হারিয়েছেন সমাজ ও সমকালের অধোগতির ফলে। আর শেষত স্থিত হয়েছেন সর্বজনের প্রতি প্রসারিত কিন্তু একান্ত ব্যক্তিগত সাহিত্যচর্চার উদার জমিনে। তাঁর সমকালের কবি ও বন্ধু বুদ্ধদেব বসু সুধীনকে বলেছেন—'স্বভাবকবি নন, স্বাভাবিক কবি'।

কৈশোরে কিংবা যৌবনের প্রথমপাদে ছোটগল্প এবং উপন্যাসের খসড়া তৈরি করলেও শেষপর্যন্ত তিনি কবিই হলেন। ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, পুস্তক-সমালোচনা, অনুবাদ, প্রবন্ধ এবং বিবিধ গদ্যও লিখেছেন তিনি তাঁর প্রতিদিনকার কার্যলিপিতে। *পরিচয়* (১৯৩১–১৯৩৬) নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেছেন। *তন্বী* (প্রথম প্রকাশ: ১৯৩০) তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। ১৯৩০ থেকে ১৯৪০— এই দশ বছর সুধীনের অধিকাংশ রচনার জন্মকাল। এক প্রবল আবেগ তাঁকে অধিকার ও আচ্ছন্ন করেছিল এই সময়ে, কোনো এক অজানা স্মৃতি হয়তো তাঁকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল তখন, অধরা এক বা অগণন অপুরণীয় ক্ষতির পরিপূরণ-আকাঙ্ক্ষায় যেন তিনি অনবরত ভাষাকাঠামো সৃষ্টি করে চলছিলেন। নিজের কবিতাযাত্রা সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন— 'আমি অন্ধকারে বদ্ধমূল, আলোর দিকে উঠছি'। অনুভবজ্ঞানের এই আত্মপ্রচার আমাদেরকে বিস্মিত ও শ্রদ্ধানত করে। 'নিবে গেল দীপাবলী; অকস্মাৎ অস্ফুট গুঞ্জন/ স্তব্ধ হল প্রেক্ষাগারে। অপনীত প্রচ্ছদের তলে,/ বাদ্যসমবায় হতে, আরম্ভিল নিঃসঙ্গ বাঁশরী/ নম্র কণ্ঠে মরমী আহ্বান;' *অর্কেস্ট্রা* (প্রথম প্রকাশ: ১৯৩৫) কাব্যের নামকবিতার শুরচ্চ এই অংশটুকুর পাঠ নিয়ে আজকের বর্তমান আলোচনায় প্রবেশ করার ইচ্ছা পোষণ করছি। এ কথা অনেক পাঠকেরই জানা আছে যে, সুধীনের কবিতার কাঠামো প্রবল যুক্তিনিষ্ঠ এবং বাক্যবিন্যাস ও শব্দস্থাপন সুমিত। বর্ণনা নির্বিকার, নিবিড় ও সুশৃঙ্খল। তাত্ত্বিক বিষয় উপস্থাপনেও চিন্তাকে তিনি অযথা বা অগত্যা তরল করতে চাননি। বাংলা ভাষার সম্পদ ও সম্ভাবনাকে তিনি অনেকটা পথ এগিয়ে দিয়েছেন অত্যন্ত সযত্নে হাত ধরে ধরে। সুধীন্দ্রনাথের লেখা ১৯০টি কবিতার পরিসর সচেতন পাঠককে এক বিশেষ বিবেচনায় দাঁড় করায় যেন কবিতার কোনো সংশয়ী ক্যানভাসের আড়াল থেকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) কাব্য-পরিমণ্ডলের প্রবল প্রভাব ও বিপুল বিস্তার থেকে মুক্তি প্রয়াসের প্রেরণায় বাংলা কাব্যক্ষেত্রে একটি বিশেষ আন্দোলনের আবির্ভাব ঘটে। বিশ শতকের তৃতীয় দশকে এ আন্দোলনের সৃষ্টি। অবশ্য বিচ্ছিন্নতার প্রেরণা এসেছে যুগের স্বাভাবিক দাবি অনুসারে অনিবার্যভাবেই। রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে অতিরোমান্টিকতায় আচ্ছন্ন বলে অভিযুক্ত করে এর মায়াজাল থেকে একটি কবিগোষ্ঠী সচেতনভাবে বেরিয়ে আসতে চাইলেন এবং তাঁরা কবিতাকে রূঢ় বাস্তবতায় প্রতিষ্ঠিত করতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হলেন। পাশ্চাত্য-সাহিত্যের প্রভাবে তাঁদের নব্য কাব্য-আন্দোলনে সমাজ-বাস্তবতা প্রাধান্য পেল। পাশাপাশি পুরাতন ধারায় কাব্যচর্চা বলতে থাকলেও কবিতা-জগতে এ নতুন ভাবনা ভিন্নতর অনুভবের সঞ্চার করলো প্রাণবন্তরূপে। নবতর এ কাব্য-ভাবনায় যাঁদের ভূমিকা ও অবদান প্রধান ছিল তাঁরা হলেন—জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০), অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৬), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), এবং

বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২)। এঁদের কাব্য-বৈশিষ্ট্য সমবেতভাবে সমকালে বাংলা কাব্য-পরিমণ্ডলে একটি নতুন ধারা তৈরি করতে পেরেছিল। আর এ ধারায় সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা চেতনার বৈদগ্ধ্যে, প্রকাশের পরিশীলিত স্নিগ্ধতায় এবং বয়নের গাম্ভীর্যে অনন্যতায় ভাস্বর। প্রকৃত অর্থে তিনি কবিতাকে লালন করেছেন প্রাতিস্বিকতায়; চিন্তা ও চেতনার সৌকর্যে।

সুধীনের জন্ম বিশ শতকের একেবারে সূচনালগ্নে। শৈশব এবং কৈশোরকাল অতিক্রম করেছেন তিনি এদেশীয় রাজনৈতিক সংকট এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির অন্তঃশীল প্রবাহের মধ্য দিয়ে। রবীন্দ্রনাথের চোখের বালি (১৯০৩) প্রকাশের মধ্য দিয়ে বাংলা কথা-সাহিত্যে বাঁক পরিবর্তন, বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫), মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা (১৯০৬), বঙ্গভঙ্গ রহিতকরণ (১৯১১), রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাপ্তি (১৯১৩), প্রমথ চৌধুরীর *সবুজপত্র* (১৯১৪) পত্রিকার আত্মপ্রকাশ প্রভৃতি ঘটনা তাঁর মানসগঠনের অন্বিষ্ট পরিবেশকে নাড়া দিয়েছিল প্রবলভাবে। আবার বয়োঃসন্ধিকালে তিনি আত্মস্থ করেছেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) এবং রশ-বিপ্লবের (১৯১৭) উন্মাদনা, যন্ত্রণা আর প্রাপ্তির গীতলতা। মূলত, বিশ শতকের প্রথমার্ধে গোটা বিশ্বের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক এবং ধর্মীয় অবস্থা ছিল সংকটাপন্ন এবং বিপর্যস্ত। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যে সময়ে কাব্য-পরিসরে প্রবেশের মানসিক প্রবৃত্তি অর্জন করছেন এবং পরবর্তীকালে ভাবনার বৈদগ্ধ্যের শাণিত প্রকাশ ঘটিয়েছেন, সে সময়ে পারিপার্শ্বিক টোটাল অবস্থাই ছিল দোলায়িত। '১৯১৪ থেকে ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীর পথে একটা প্রচণ্ড ভাঙা-গড়ার যুগ— রাষ্ট্র, সমাজ এবং তার অর্থনৈতিক ভিত্তি অতি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছিল। পদার্থ বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, তুলনামূলক নৃতত্ত্ববাদের ক্ষেত্রেও নানা বৈপ্লবিক চিন্তাধারার আবির্ভাব ঘটেছিল।'[১] তদুপরি মার্কর্সবাদী সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা বিকাশের চেষ্টা; ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা (১৯২৭) এবং ১৯২৯-৩০ সালের বিশ্বব্যাপি অর্থনৈতিক বিপর্যয় সেই সময়টাকে অস্থিরতায় ও অনিশ্চয়তায় আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এই বিচিত্র চিন্তাধারার ঘাত-প্রতিঘাতে তিরিশের দশকের বাঙালি কবিদের চেতনা আন্দোলিত হচ্ছিল। তারা জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এই আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক সংকটকে উপলব্ধি করলেন। স্বভাবতই সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সচেতন প্রজ্ঞায় এবং রচিচর বৈদগ্ধ্যে যুগের জাটিলতা অনুধাবন করেছিলেন। আর সে অনুভূতি প্রকাশের প্রয়াসে কবিতাকে রূঢ় বাস্তবতায় দাঁড় করাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার, সমাজ জীবনের সমগ্রতাকে হয়তো ধারণ করেন কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী; কিন্তু তার পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ করতে পারেন না কেউই। একটি খণ্ডাংশকে যথার্থভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেন মাত্র। আর শিল্পীর বা স্রষ্টার এই সমগ্রতার চেতনা আসে তাঁর আবেগ, বুদ্ধি, ইতিহাস ঐতিহ্যবোধ এবং জীবনদর্শন থেকে। তাই সৃষ্টির চরিত্র বুঝতে হলে লেখকের জীবনদর্শন জেনে নেবার তাগিদ আসে অনিবার্যভাবেই। পর্যবেক্ষণে স্পষ্ট ও লক্ষযোগ্য যে, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সমসাময়িক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ তাঁর কাব্য প্রেরণাকে অনেকাংশে প্রভাবিত করেছে। তাঁর কবিতায় তাই কালের চিত্র এসেছে বিচিত্র মাত্রায়। তিনি যুগধর্মকে অস্বীকার করেন নি; বরং যুগ-মানসকে অন্বেষণ করেছেন কবিতায়; ধারণ করেছেন শব্দের সুতীব্র বাঁধনে। রবীন্দ্র-পরিমণ্ডলের বাইরে নতুন এক কাব্যধারা নির্মাণের প্রত্যয়ে স্থীতধী থাকলেও বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ ও অমিয় চক্রবর্তীর মতো সুধীনেরও প্রথম পর্বের কবিতায় রবীন্দ্র প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। তাঁর আদি রচনা তন্বীর দিকে দৃষ্টি ফেরালেই বক্তব্যটি খোলাসা হবে—

ক. অধুনা-আনীত নব অলিখিত
লেখনী মোর,
কি জানি কেমন ভাগ্য লেখন
আছে রে তোর!
মুখাগ্রে তোর ছুটিবে কি গান?
পাবি লাঞ্ছনা? মিলিবে কি মান?
কোথা কবে হবে কাজের খতম,
নেশার ভোর,
জানি না, এই তো জাগিলি প্রথম,
লেখনী মোর!
(নবীন লেখনী : তন্বী)

খ. তোমার ভ্রুকটি তাই শতমুখী চাবুকের মতো
গগনে আভাসে,
তোমার আকাশবাণী রন্ধ্র রবে সম্প্রতি জাগ্রত
কুলিশে প্রকাশে,
তোমার উডডীন কেশ, ধৃতফণা নাগিনীর প্রায়
ব্যাপ্ত নভে নভে,
তোমার সন্তপ্ত শ্বাস বেণুবনে আতঙ্ক জাগায়
বিপুল আরবে।
(চিরন্তনী: ওই)

'উপরের কবিতা দুটিতে সুধীন্দ্রনাথের নিজস্ব টেক্‌নিক এবং ভঙ্গির সামান্য ইঙ্গিত পাওয়া গেলেও এখানে যথাক্রমে *মানসীর* 'ভুল ভাঙ্গা' ও *কল্পনার* 'বর্ষশেষ'-এর প্রভাব সুস্পষ্ট।'[২] তবে শব্দ নির্বাচনে তাঁর বিশিষ্টতার প্রয়াস চোখে পড়ে। কবিতার বয়নে নিশেষ শব্দ নির্মাণ ও ভাষা প্রয়োগের অনন্য কৌশলে তিনি ক্রমান্বয়ে নিজস্ব একটা অবস্থান তৈরি করতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্র-অতিরোমান্টিকতার ভাবজগত থেকে কবিতাকে কঠিন বাস্তব অবয়বে প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সক্রিয় শিল্পী। 'তিনি আধুনিক জীবনের জটিলতার জট। মননশীল, দার্শনিক এবং বড় বেশি আভিধানিক। বুদ্ধিমত্তা তাঁর শিরার শোণিত প্রবাহ, অধ্যবসায় তাঁর প্রসূতি। শুদ্ধ চৈতন্য তাঁর অন্বিষ্ট।'[৩] তাঁর কবিতায় শাহরিক নৈরাশ্যবোধ, অস্তিত্ববাদ, প্রকৃতি, রাজনীতি, প্রেম, সময়চেতনা, ইতিহাস-ঐতিহ্যবোধ, ঈশ্বরভাবনা, ক্ষণবাদ, মৃত্যুচেতনা প্রভৃতি বিষয় প্রবলভাবে উপস্থিত। 'কাব্যরচনায় গভীর নিষ্ঠাবান সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত, দার্শনিক, তত্ত্বানুসন্ধানী এবং বক্তব্য বিশ্লেষণে অসাধারণ বুদ্ধিমান। অত্যন্ত মনোযোগী শিল্পী হিশেবে, সচেতন অনুভূতির বিবেচনায় তিনি বাংলাকে আবেগের উচ্ছলতা থেকে আধুনিক মননশীলতা ও যুক্তির রাজ্যে উপস্থিত করেছিলেন। তিনি তাঁর পাণ্ডিত্য, বুদ্ধি ও ঔৎসুক্য কাব্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলেন। কবিতা যে শিল্প এবং সে ক্ষেত্রে অনুশীলনের প্রয়োজন যে আছে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের পূর্বে এত স্পষ্টভাবে আমরা তা বুঝিনি। অত্যন্ত বেশি সচেতনা কবির কাছে কবিতার কলাকৌশল একাগ্র নিষ্ঠা এবং সুচিন্তিত সাধনার ফল।'[৪] এই একাগ্র নিষ্ঠা এবং সুচিন্তিত সাধনা সুধীনের

কবিতা নির্মাণের অনন্য শক্তি হিশেবে সর্বদা ক্রিয়াশীল ছিল। তিনি মননশীলতা আর চেতনার বৈদগ্ধ্য ও যুক্তিবাদে কবিতার ভাষা তৈরি করেছেন। শব্দ-নির্বাচনের ক্ষেত্রে যেমন বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি শব্দ ব্যবহারেও থেকেছেন প্রবল সচেতন। তিনি জানতেন কবির সাফল্য কিংবা স্বাতন্ত্র্য নির্ভর করে শব্দ ব্যবহারের পারদর্শিতার ওপর। 'কবি যখন শব্দকে ব্যবহার করেন, তখন সে শব্দের অর্থের সম্ভাবনার কথা ভাবেন এবং শব্দটির গ্রহণ ক্ষমতা কতটুকু এবং সে কতটুকু সত্যকে অবলম্বন করে থাকতে পারবে—তা বিবেচনা করেন। তিনি শব্দের দ্বারা বস্তুকে চিহ্নিত করেন। ভাবকে গ্রহণযোগ্য করেন এবং জটিলতাকে বিকল করেন।'[৫] সুধীনের কবিতায় শব্দ-প্রয়োগের নিদর্শন—

ক. হিতবুদ্ধিহন্তারক ক্ষণিকের এ-আত্মবিস্মৃতি;
তোমারই বিমূর্ত প্রশ্ন জীবনে নিশীথ বিরলে
প্রমাণিবে মূল্যহীন আজন্মের সঞ্চিত সুকৃতি।।
মৃত্যুর পাথেয় দিতে কানা কড়ি মিলিবে না যবে,
রূপান্ধ যুবার ভ্রান্তি সেই দিক মহাসত্য হবে।
(মহাসত্য: অর্কেস্ট্রা)

খ. কপোল কল্পনা ত্যাগ; নিরাসক্তি অসাধ্য সাধন;
অনন্তপ্রস্থান মিথ্যা; সত্য শুধু আত্মপরিক্রমা;
বিদ্রোহে স্বাতন্ত্র্য নাই; মুক্তি মানে নিরূপায় ক্ষমা;
(সৃষ্টি রহস্য: ক্রন্দসী)

গ. বিয়োগান্ত ত্রিভুবন বিবিক্তির বোমারচ বিলাসে;
জঙ্গমের সহবাসে বৈকল্যের দুঃস্থ সন্নিপাত।।
প্রবৃত্তির অধিচ্ছেদে তবু নেই পূর্ব বা পশ্চাৎ;
বিজ্ঞানের বিবর্তন প্রপঞ্চের নিত্য অনুপ্রাসে;
প্রতিসম বৈপরীত্য সম্পূর্ণের দুর্মর প্রকাশে;
শক্তির অব্যয়ীভাবে তুল্যমূল্য ঘাত-প্রতিঘাত।"
(বিপ্রলাপ: সংবর্ত)

ফরাসি কবি মালার্মের কাব্যাদর্শ অনুসরণে তিনি কবিতায় শব্দ ব্যবহারের প্রতি সশ্রদ্ধ থেকেছেন। *সংবর্ত* (১৯৫৩) কাব্যের মুখবন্ধে কবি লিখেছেন—'মালার্মের প্রবর্তিত কাব্যাদর্শই আমার অন্বিষ্ট। আমিও মানি যে কবিতার মুখ্য উপাদান শব্দ; এবং উপস্থিত রচনাসমূহ শব্দসমূহের পরীক্ষা রূপেই বিবেচ্য।'[৬] অবশ্য সুধীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় শব্দ প্রয়োগের বিষয়টিকে জটিলতামুক্ত, বোধ্য করে তুলতে পারেননি–এমন ধারণা প্রচলিত। আর এর পেছনে না-কি ক্রিয়াশীল ছিল তার সংস্কৃত ও ইংরেজি ভাষায় বিশেষ দক্ষতা এবং বাংলা ভাষা, বিশেষত, সরলীকৃতভাবে আয়ত্ব না করতে পারার দুর্বলতা। 'কৈশোরে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর মার সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলতেন।'[৭] অবশ্য 'তাঁর কবি-ভাষা হিন্দি কণ্টকিত হয়নি কখনো। সংস্কৃতপ্রেমিক কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর কবিতার শব্দসম্ভার বৃদ্ধির জন্য হানা দিয়েছেন সংস্কৃতের ভিতর গোলায়। সেখান থেকে সংগ্রহ করে এনেছেন অনেক অপ্রচলিত এবং অব্যবহৃত সংস্কৃত ভাষার মুদ্রা, যাকে তিনি বাংলা কবিতার বাজারে ছেড়েছেন। আর বহু চেনা এবং অভিধান নির্ভর সংস্কৃত শব্দ তো তাঁর শিক্ষা ও অভিজ্ঞতায়

ছিলই। এই প্রচলিত ও অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতার কবি-ভাষা নির্মাণে সহযোগিতা করেছে বেশি। তার উপর তাঁর নিজের সৃষ্ট শব্দ তো আছেই।'[৮] ফলে সুধীনের কবিতা 'দুর্বোধ্য' হয়ে উঠেছে— এ অভিযোগ ছিল বরাবরই। যদিও কেউ কেউ এ কথিত দুর্বোধ্যতাকে কাব্য-আঙ্গিকের বিশিষ্ট প্রকৌশল হিশেবেও ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন। অবশ্য প্রসঙ্গত, একথা বলে নেয়া যায়— দুর্বোধ্যতা আর বোঝার অস্পষ্টতার মধ্যে যদি কোনো গোলযোগ না পাকায় তাহলে তাঁর কবিতাকে 'আভিধানিক' অভিধায় হয়তো ফেলা চলে। কিন্তু এখানেই শেষ কথা নয়। কবিতা কথা বলে ইঙ্গিত ধারণ করে; ভাবের গাঢ়তা প্রকাশ করে যৎসামান্যই। আর সে অর্থে একটি কবিতার পাঠ-উদ্ধার করতে যে ধৈর্য, চেষ্টা আর জ্ঞানের গভীরতা প্রয়োজন তা-ও বোধ হয় কবিতা-পাঠকের থাকা দরকার। সব শিল্পের ক্ষেত্রেই বোধ করি এ কথা প্রাসঙ্গিক। অন্তত ন্যূনতম বোধ কিংবা ধারণ ক্ষমতা না থাকলে শিল্পের সৌকর্য অনুভব হয়ে ওঠে দুঃসাধ্য। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা পড়ার ক্ষেত্রেও এ বিষয়টি ভাবনায় রাখা দরকার। আর তখনই হয়তো আমরা তাঁর শিল্প-ভাবনার দ্যোতনার বিস্ময়ের মুখোমুখি হতে পারবো।

বিষয়-বৈচিত্র্যের আপাত বিভাজনে দেখা যায়—সুধীনের প্রথম দিকের কবিতাতে প্রেম, প্রকৃতি, নৈরাজ্য, কাল প্রভৃতি বিপুলভাবে চিত্রিত (*তন্বী*, ১৯৩০; *অর্কেস্ট্রা*, ১৯৩৬; *ক্রন্দসী*, ১৯৩৭; *উত্তর ফাল্গুনী*, ১৯৪০)। দ্বিতীয় পর্যায়ের রচনায় চেতনার বিবর্তনের পথ ধরে অনিবার্যরূপে প্রকাশ পেয়েছে রাজনীতি চিন্তা, স্বাধিকারচেতনা, ঐতিহ্যবোধ, ঈশ্বর-ভাবনা এবং মৃত্যুচিন্তা (*সংবর্ত*, ১৯৫৩; *দশম*, ১৯৫৬)। আর অনুবাদ সংকলন *প্রতিধ্বনি* (১৯৫৪)-তে স্থান পেয়েছে শেকস্‌পীয়র, হাইনে, মালার্মে, ডি. এইচ. লরেন্স, গ্যয়টে, পল ডালেরা, জন মেসফিল্ড এঁদের কবিতার ভাবানুকরণ। মূলত তাঁর কবিতার বিষয়-বৈচিত্র্য এবং প্রকাশভঙ্গি গভীর মননশীলতার পরিচায়ক। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সমাজলগ্ন কবি। সমাজ, মানুষ আর রাষ্ট্রের বহুবিধ জটিল অনুষঙ্গ তাঁর ভাবনায় প্রোথিত ছিল। বাস্তবতা সংশ্লিষ্টতায় তাঁর গভীর মনোযোগের প্রমাণ মেলে বিভিন্নভাবে। 'পৃথিবী যে আসন্ন ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, তা চিত্রিত হয়েছে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'উটপাখি' কবিতায়। আলোচ্য কবিতায় কবি একটি বিশেষ যুগকে রূপায়িত করার প্রয়াস পেয়েছেন।'[৯]

আমার কথা কি শুনতে পাও না তুমি?
কেন মুখ গুঁজে আছ তবে মিছে ছলে?
কোথায় লুকাবে? ধু ধু করে মরুভূমি;
ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে ছায়া ম'রে গেছে পদতলে।
আজ দিগন্তে মরীচিকাও যে নেই;
নির্বাক, নীল, নির্মম মহাকাশ।
(উটপাখী: ক্রন্দসী)

'উটপাখি' কবিতাটি আত্মবিবরণ, আত্মপ্রতিফলন আর সমাজ-পরিপ্রেক্ষিতে মানব জীবনে বাস্তবতা-কল্পনায় অবগাহনের ভাবনামিশ্রিত এবং বিচিত্র চিন্তা-জাগানিয়া বিবরণের বর্ণে মাখা। অভিভাবকীয় সুরে কবি এখানে নির্মাণ করেছেন কবিতার কথামালা; প্রাজ্ঞ এক সমাজ-বিশ্লেষক যেন বলছেন তাঁর দেখে-আসা সকল অনুভব, অভিজ্ঞতা আর পরামর্শের ব্যাপারাদি। ফেলে-আসা সময়ের ও চিন্তার গতি-প্রকৃতির স্মৃতি-রোমন্থনে কবি মাঝে মাঝে নিবিড় হয়ে ওঠেন। মধ্যে মধ্যে হয়তো কোনো প্রিয়মুখের অনুপস্থিতিও তাঁকে বিষণ্ন করে তোলে। তাঁর অনুভব– 'নিষাদের মন মায়ামৃগে মজে নেই;/ তুমি বিনা তার সমূহ

সর্বনাশ।/কোথায় পলাবে? ছুটবে বা আর কত?/উদাসীন বালি ঢাকবে না পদরেখা।/প্রাক্‌পুরাণিক বাল্যবন্ধু যত/বিগত সবাই, তুমি অসহায় একা।' নিঃসঙ্গতা, অপারগতা আর সময়ের অপার শূন্যতায় মানুষের নির্মম পরিণতির কথা ভাবতে গিয়ে তিনি অন্তঃসারশূন্য সমাজের ছবি দেখেছেন নিজের চোখে ও অনুভবে। মরুভূমিতে পানি ঢেলে সবজি চাষের চেষ্টা বৃথা, যেমন ক্ষুধার বাস্তবতাকে অস্বীকার করে চলার বোকামি সত্য। ইচ্ছা নামক ঘুড়িকে উড়তে দেওয়ার মধ্যে আছে স্বাধীনতা; সে স্বাধীনতা চিন্তা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার। বিপদ মোকাবিলা করার জন্য যে জাগতিক জ্ঞান দরকার তা বোধকরি সকলে আয়ত্ব করতে পারে না— বিশেষত প্রতিভার প্রশস্ত বারান্দায় যাঁরা ঠায় দাঁড়িয়ে মেধাবৃত্তির অমোঘ বাতাসে চুল ওড়াতে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন, তারা তো ওই নিরেট সত্যের পাটাতন থেকে নিশ্চিত দূরত্বে আপন অবস্থান নির্মাণ করেন হয়তো বা নিজেরই অজান্তে; কোনো অলৌকিক আবেশের অপরিহার্য প্রবল টানে। কবি কি সংসার-বিবাগি মরুচারি সন্ন্যাসী হতে চেয়েছিলেন? কে জানে সে কথা! তবে তিনি জাগতিক কৃত্রিম জীবন-ব্যবস্থার চেয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং স্বাভাবিক ও প্রতিযোগিতাহীন জীবনকেই হয়তো আরাধ্য জেনেছেন— বাস্তবতার কঠোর-কঠিন দরোজায় পা ফেলে ফেলে অবশেষে অশেষ ক্লান্ত হয়ে। নতুনের পথে; এবং তা অবশ্যই কৃত্রিমতাবিহীন— তাঁর মানসিক পরিভ্রমণ এই কবিতায় একটা নিটোল ছবি হয়ে ধরা পড়ে পাঠকের সোজা চোখে।

ফাটা ডিমে আর তা দিয়ে কী ফল পাবে?
মনস্তাপেও লাগবে না ওতে জোড়া।
অখিল ক্ষুধায় শেষে কি নিজেকে খাবে?
কেবল শূন্যে চলবে না আগাগোড়া।
তার চেয়ে আজ আমার যুক্তি মানো,
সিকতাসাগরে সাধের তরণী হও;
মরুদ্বীপের খবর তুমিই জানো,
তুমি তো কখনও বিপদ্‌প্রাজ্ঞ নও।
নব সংসার পাতি গে আবার চলো
যে-কোনও নিভৃত কণ্টকাবৃত বনে।
মিলবে সেখানে অন্তত নোনা জলও,
খসবে খেজুর মাটির আকর্ষণে॥
(ওই)

কল্পনারাজ্য আর স্বপ্নময়তার অপরপারে নিশ্চিত মুক্ত জীবনচর্চার প্রতি কবি সুধীন দত্তের বিশেষ টান আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে; জীবনের আপাত বন্দীদশা থেকে মানবের সহজ বিচরণ আর মনের অবাধ গতির নিশ্চয়তাকে তিনি অগ্রবিবেচ্য রেখেছেন সবসময়। অপ্রয়োজনীয় অহমিকা— যা আমাদেরকে কেবল প্রতিনিয়ত বিপদ আর শঙ্কার মধ্যেই আটকে থাকতে প্রেরণা যোগায়, তার অপ্রশস্ত ভুবন থেকে মানুষকে তিনি সরিয়ে রাখতে চেয়েছেন নিরাপদ দূরত্বে। ওই অনুভবের অনুরণন শোনা যাক—'কল্পলতার বেড়ার আড়ালে সেথা/গ'ড়ে তুলব না লোহার চিড়িয়াখানা;/ডেকে আনব না হাজার হাজার ক্রেতা/ছাঁটতে তোমার অনাবশ্যক ডানা।/ভূমিতে ছড়ালে অকারী পালকগুলি,/শ্রমণশোভন বীজন বানাব তাতে;/উধাও তারার উড্ডীন পদধূলি।/পুঙ্খে পুঙ্খে খুঁজব না অমারাতে।/তোমার নিবিদে বাজাব না ঝুমঝুমি,/নির্বোধ লোভে যাবে না ভাবনা মিশে;/সে-

পাড়া-জুড়নো বুল্‌বুলি নও তুমি/বর্গীর ধান খায় যে ঊন্‌তিরিশে ॥' আমরা যদি নিবিড়চোখে তাকাই তাহলে দেখবো— সমকালের যাপিত জীবন ও পৃথিবীর চালচিত্রের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে লিপ্ত হয়ে আছে সুধীন্দ্রনাথের কবিতার শরীর— রক্ত ও মাংসসমেত সমূহ প্রবণতা ও প্রস্রবণ। মানবিক সম্পর্ক ও পারস্পরিক সম্প্রীতির ব্যাপারে তাঁর ভাবনার অতলতাকে আমরা স্পর্শ করি তাঁরই নির্মিত কবিতা-কথনের ভেতর দিয়ে পরিভ্রমণ করার সময়। আর সামাজিক এবং ব্যক্তিগত দায় ও দায়িত্বের বিষয়েও যে তিনি প্রবল সচেতন, তাও আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না। প্রসঙ্গত 'উটপাখি' কবিতার শেষাংশের পাঠ নেওয়া যেতে পারে—

আমি জানি এই ধ্বংসের দায়ভাগে
আমরা দু-জনে সমান অংশীদার;
অপরে পাওনা আদায় করেছে আগে,
আমাদের 'পরে দেনা শোধবার ভার।
তাই অসহ্য লাগে ও-আত্মরতি।
অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?
আমাকে এড়িয়ে বাড়াও নিজেরই ক্ষতি।
ভ্রান্তিবিলাস সাজে না দুর্বিপাকে।
অতএব এসো আমরা সন্ধি ক'রে
প্রত্যুপকারে বিরোধী স্বার্থ সাধি:
তুমি নিয়ে চলো আমাকে লোকোত্তরে,
তোমাকে, বন্ধু, আমি লোকায়তে বাঁধি ॥
(ওই)

সমাজ-বাস্তবতা কথনে এখানে নিবিড় চিন্তাশীলতা বিযুক্ত। সমাজসত্য চিত্রণে সুধীনের এ বোধের সঙ্গে বন্ধুদের বসুর একটি চটুল খেদোক্তির সাদৃশ্য মেলে—

পাৎলুন, আঁটলুম, বড়োলোক চাটলুম, এখন তাহ'লে করা
কী?
কী? কী?
কী করি? কী করি?
জবিনটা থোড় বড়ি
খাড়া বড়ি খাড়া থোড়, তবে কি গলায় দড়ি?
না কি জলে ডুবে মরি?
(চলচ্চিত্র: দময়ন্তী)

বিশ্বব্যাপি অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সে সময়ে ভারতবর্ষে মানব জীবনের প্রতিনিয়ত সংগ্রামের যে চিত্র—তা কৃত্রিম নয়। আর সে পরিপ্রেক্ষিতেরই রূপায়ণ উপর্যুক্ত পংক্তিগুলি। আর সুধীন্দ্রনাথের 'উটপাখি' কবিতায় আত্মপ্রবঞ্চিত মানুষের যে রূপায়ণ কালিকচিত্রে– তা তাঁর সচেতন সমাজ উপলব্ধির প্রথম পর্যায়ের প্রয়াস। সুধীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের কবিতার ভাবনাবলয় গঠিত ছিল পাশ্চাত্য শিল্প-সাহিত্যের প্রভাব এবং যুগ-যন্ত্রণার খোলসের ভিতর। *অর্কেস্ট্রায়* যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটেছে, তা বিস্তৃত হয়েছে *সংবর্ত* পর্যন্ত। ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদের উত্থান, দ্বিতীয়

বিশ্বযুদ্ধের জাটিল্য হিরোশিমা-নাগাসাকি'র গভীর ক্রন্দননিনাদ তাঁর কবি মানসে বিস্তর প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার করেছিল। সমকালীন জীবন জটিলতাকে কবি দেখেছেন এভাবে—

আসন্ন প্রলয়:
মৃত্যুভয়
নিতান্তই তুচ্ছ তার কাছে।
... ...
চিশ্চিহ্ন সে-নচিকেতা; নৈরাশ্যের নির্বাণী প্রভাবে
ধূমাঙ্কিত চৈত্যে আজ বীতাগ্নি দেউটি,
আত্মহা অসূর্যলোক, নক্ষত্রেও লেগেছে নিদুটি।...
একচক্ষু ছায়া,
দীপ্ত-নখ, স্ফীত-নাসা, নিরিন্দ্রিয় বৈদ্যুতিক কায়া
চতুর্দিকে চক্রব্যুহ বাঁধে।
(উজ্জীবন: সংবর্ত)

এসব পংক্তিতে ব্যক্তির সংকট সময় ও সমাজ অভিজ্ঞানের নির্যাসে ছেঁকে তুলে আনা হয়েছে যেন। বিশ শতকের অবক্ষয় সচেতন রোমান্টিকরা রূঢ়-বাস্তবতার অন্তরালে কল্পনা করেন পজেটিভ অর্থে। আর ভাবালুতা থেকে ধ্রুপদী ফর্মে শিল্পকে দাঁড় করার তাগিদে এ আঙ্গিক ব্যবস্থা ব্যবহৃত হয়েছে স্বাধিকার অর্জনের প্রেরণা থেকে। সে প্রয়োজনেই নিরেট বাস্তবতার রূপায়ণে কবিরা বস্তু আর নির্বস্তুকে একই সরল রেখায় নিয়ে এসেছেন অনন্য কৌশলে। সুধীনের কবিতায়ও অদৃশ্য এক প্রবল অনুভূতিকে উপস্থাপন কিংবা পরিবেশন টেকনিকের মাহাত্ম্যে অনুভবযোগ্যতা অর্জন করতে দেখা যায়। আর এভাবেই হৃদয়ের নিবিড় স্পন্দন ধরা-ছোঁয়ার গণ্ডিতে এসে পৌছায়। তাঁর 'শাশ্বতী' কবিতায় এমনি এক পরিবেশ নির্মিত হয়েছে—

অনাদি যুগের যত চাওয়া, যত পাওয়া
খুঁজেছিল তার আনত দিঠির মানে।
একটি কথার দ্বিধাথরথর চূড়ে
ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী;
একটি নিশেষ দাঁড়াল সরণী জুড়ে,
থামিল কালের চিরচঞ্চল গতি;
(শাশ্বতী: অর্কেস্ট্রা)

প্রেয়সীর ব্রীড়াবোধকে ক্রমকম্পনরত এক চূড়ার সঙ্গে তিনি তুলনা করলেন। অস্পৃশ্য, অদ্রশ্য নির্বস্ত্র এভাবে কায়ার বস্তুতে তার পরিচিতি তুলে ধরতে সমর্থ হয়। একটি মুহূর্তের বিশেষ এই অনুভূতিকে চিহ্নিত করতে গিয়ে তিনি কথাচিত্রও নির্মাণ করেন। পথে থমকে দাঁড়ায় কালের অমিত গতি। এই অবয়বশূন্য কালের গতিকে আমরা যেন স্ব-শরীরে পথের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি— বর্ণনা এমনি সুবিন্যস্ত এবং মননস্নাত। 'শাশ্বতী' কবিতায় প্রকৃতির মোহনকান্তি এবং বিমর্ষতা চিত্রিত হয়েছে। অন্তরালে প্রবহমান থেকেছে মানব চৈতন্যের নৈরাশ্যবোধ। আর প্রেম-ভাবনার এক নীরব নিথর ফল্গুধারা প্রবাহিত হয়েছে এ কবিতার সৌন্দর্যের শরীর বেয়ে। সুধীনের কবিতায় প্রেম-ভাবনা যে সর্বদাই একটা নির্দিষ্ট ফর্মে প্রকাশ পেয়েছে— তা নয়। যুগের অস্থিতিশীলতায় যেমন তিনি প্রেমের অমিত সুস্পর্শ

অনুভব করেছেন, তেমনি অবসরে স্মৃতি রোমন্থনেও তাঁর ভাবনার প্রকাশে স্থান করে নিয়েছে প্রেয়সীর মুখ। জীবনের বাস্তবতা থেকে যে সময় অতিবাহিত— তা চিরবিদায়ী। তাকে ফিরে পাবার বাসনা অলীক কল্পনা মাত্র। জীবনানন্দে এ চেতনা প্রবল। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় এ বোধ অতীত স্মৃতি রোমন্থনে মথিত। অবশ্য এ ভাবনার প্রকাশ খুবই সীমিত অবয়বে। উদাহরণ—

আছে কি স্মরণে, সখী, উৎসবের উগ্র উন্মাদনা,
করদ্বয়ে পরিপুতি, চারি চক্ষে প্রগলভ বিস্ময়
শূন্য পথে দুটি যাত্রী, সহসা লজ্জার পরাজয়,
প্রতিজ্ঞার বহুলতা, আশেষের যুগ্ম প্রবর্তনা?
(অপচয়: অর্কেষ্ট্রা)

আবার তাঁর কবিতায় যৌবনের খোলা উন্মাদনাও প্রকাশ পেয়েছে—

স্খলিতবসন উরুতে তোমার;
অনাদি নিশার শান্তি উদার
(অর্কেষ্ট্রা: অর্কেষ্ট্রা)

প্রেমের কবিতায় আবেগের তীব্রতা, বাসনা ও বেদনার অলাজ ও ব্যক্তিগত প্রকাশের যে ভার, তার সন্ধান বাংলা কবিতায় সহজলভ্য নয়; বৈষ্ণব কবিতা থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পেরিয়ে সুধীনের সমকালে পরিভ্রমণ করলে এ কথার সত্যতার খানিকটা অনুসন্ধান আমরা অবশ্যই পাবো। সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রকৃতি ও প্রেয়সীর প্রতি অনুভবের যে সরল-স্বাভাবিক-সুন্দর পরিবেশন, তার উপস্থিতি বিরলই বটে! এই বোধ বিবেচনায় রেখে বলা যায়– *উত্তর ফাল্গুনী* কাব্যের 'দুঃসময়' কবিতাটি বোধহয় প্রেমরহস্য, মনোবল আর অহংকার বিনাশের গল্পমালা। কবিতাটির আরম্ভ পাঠকের মনে ও মগজে একটা মৃদু বাতাসের নাড়া দিয়ে যায়— 'মোদের সাক্ষাৎ হল অশ্লেষার রাক্ষসী বেলায়,/সমুদ্যত দৈবদুর্বিপাকে।–' কালের প্রতিকূলতা আর মানুষের সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে যে বিরাট-ব্যাপক টানাপড়েন– তারই সামান্য আভাস আমরা এই পাঠ থেকে পেতে পারি। এরপর কবি সাজাতে থাকেন স্বপ্ন, হতাশা, বিচ্ছেদ, বিপদ আর কল্পনা বিহারের কথারাজি। লিখছেন—

আধো-জাগা অগ্নিগিরি আমাদের উদ্ধত হেলায়
সান্দ্র স্বরে কী অনিষ্ট হাঁকে;
বিচ্ছেদের খর খড়্গ কোথা যেন শানায় অসুরে,
তারই প্রতিবিম্ব হেরি মুহুর্মুহু আকাশমুকুরে;
বজ্রধ্বজ প্রভঞ্জন রথ রাখি অলক্ষ্যে, অদূরে
ফুৎকারিছে দিগ্বিজয়ী শাঁখে;
আসে নাই সন্ধিলগ্ন, অমা তবু কবরী এলায়
বৈধব্যের অকাল বিপাকে ॥
(দুঃসময়: উত্তর ফাল্গুনী)

মানুষের কাপুরুষতা এবং সমাজের চরিত্রহীনতার জন্য নর-নারীর যে অমিত কষ্ট, তার কিছু হিসেব ও ছবি আঁকতে চেয়েছেন সুধীন তাঁর কবিতার নিবিড় উঠানে। কল্পনার অজানা রাজ্য আর প্রাপ্তির আনন্দকে সামনে রেখে তিনি গল্পের কাঠামো বানিয়েছেন সমূহ বিলাস ও অন্যায়ের দায়জনিত লজ্জার নরম কাঁথা গায়ে জড়িয়ে জড়িয়ে। দুঃস্বপ্নের অন্তরালে সুধীন্দ্রনাথ কেবল স্বপ্নসাধের ইমারত গড়ার আহ্বান নিয়ে হাজির থেকেছেন স্থিরচিত্তে। এই

কবি প্রেমে ব্যবধান ও বিচ্ছেদের চেয়ে নৈকট্য আর আস্থার অটলতার প্রতিই প্রবলভাবে বিশ্বাসী। তাঁর নিরাবেগ ও সরল বিবরণ— 'জানো না কি, নিঃশঙ্কিনী, যদিও বা সত্য হয় আজ/আমাদের অবোধ স্বপন,/যদিও মার্জনা করে ঈর্ষাপর ক্লীবের সমাজ/যুগলের অমর্ত্য মিলন,/তথাপি নিষ্ফল সবই।— আমাদেরই দুর্মর অতীত/অতর্কিত ভূকম্পনে বিনাশিবে বিশ্বাসের ভিত;/প্রেতাকুল ব্যবধানে সঞ্জীবনী বাহুর নিবীত/ছিন্ন, ভিন্ন হবে অনুক্ষণ;/অহেতুক অপব্যয়, অনুচিত অর্চনার লাজ/আস্ফালিবে স্তব্ধ দুঃস্বপন ॥' ওই সময়ের প্রবাহে অনুভবজ্ঞানের ওপর ভর করে মানুষ এক সময় অসত্য থেকে বাস্তবের পথে অগ্রসর হয়— এই নিশ্চিত খবর কবি সুধীন জানতেন বলেই অনুমিত হয়।

রাজনীতিচেতনা সচেতন মানবসত্তার এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। কবিরা যেহেতু সচেতন সমাজ শিল্পী, তাই তাঁদের কবিতায় থাকবে রাজনীতির অনুষঙ্গ— এটাই স্বাভাবিক এবং আধুনিকতার মঞ্চে অনিবার্যও বটে। তিরিশের কবিরা সচেতনভাবেই কবিতায় রাজনীতির সংশেষ ঘটিয়েছেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় রাজনীতির উল্লেখ ও প্রয়োগ স্পষ্ট এবং আবেগহীন। যেমন—

তুমি বলেছিলে জয় হবে, জয় হবে;
নাট্‌সী পিশাচও অবিনশ্বর নয়।
জার্মানি আজ ম্রিয়মান পরাভবে;
পশ্চিমে নাকি আগত অরুণোদয়।
... ...
স্থগিত ভারতে আপ্ত কালান্তর,
জিন্না যেহেতু বিমুখ গান্ধিবাদে।
(১৯৪৫: সংবর্ত)

মূলত 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত *সংবর্ত* থেকে সমকালীন রাজনৈতিক সামাজিক ইতিহাসকে কাব্য বিষয়ে পরিণত করেন।[১০] তিনি পথ-পরিক্রমায় উপমহাদেশের রাজনৈতিক দোলা ও বৈশ্বিক সংকট চেতনায় ধারণ করেছেন। দেখেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী রাজনৈতিক বিরাট ব্যাপক পরিবর্তন। দেশভাগ-পরবর্তী উপমহাদেশীয় প্রেক্ষাপটে দেখেছেন প্রত্যাশিত স্থিতিশীলতা না পাবার যন্ত্রণা ও খেদ। আর তাই ধরেই নিয়েছিলেন যে, যন্ত্রণাই জীবনের জন্য গভীর সত্য; এখানে স্বস্তি কিংবা শান্তির প্রত্যাশাই এক অর্থে অর্থহীন। তাঁর ভাষায়—

ক. যন্ত্রণাই
জীবনের একান্ত সত্য, তারই নিরচ্ছেদে
আমাদের প্রাণযাত্রা সাঙ্গ হয় প্রত্যেক নিমেষে।
(নরক : ক্রন্দসী)
খ. হাতুড়িনিষ্পিষ্ট ট্রট্‌স্কি, হিটলারের সুহৃদ স্টালিন;
মৃত স্পেন, ম্রিয়মান চীন,
কবন্ধ ফরাসীদেশ। সে এখনও বেঁচে আছে কিনা,
তা সুদ্ধ জানি না।।
(সংবর্ত: সংবর্ত)

ঈশ্বরে বা সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস থাক-বা-না-থাক আমরা কিন্তু বিপদে পড়লে কিংবা প্রবল হতাশা ও ক্লান্তির মধ্যে অবগাহনের কালে একজন বা একাধিক বিধাতার কাছে অবনত মস্তকে হাঁটু গেঁড়ে প্রার্থনায় মগ্ন হই। বিধাতাকে অস্বীকার হয়তো করেননি কবি সুধীন; তবে তাঁর নানান কবিতায় বিধাতার উপস্থিতি বিষয়ে সংশয়ের কথা আমরা জানি। আবার আরাধ্য মানুষের জন্য আকুতি প্রকাশের সময় এই কবিকে বিধাতার কাছে দ্বারস্থ হতে দেখি। কবি ও দার্শনিক সুধীন জানতেন— পৃথিবীতে ভগবান যদি না থাকেন, প্রেম ও ক্ষমা যদি মিথ্যা হয়, তাহলেও মানুষ তার অমর বাসনার উচ্চারণ করেই ভুবনকে তাৎপর্য দান করতে পারে; আর এভাবেই অনুভবের পীড়িত-অবস্থা থেকে মুক্তির পথে প্রবেশ করে সচেতন ও প্রজ্ঞাবান মানুষ। কবিতাটির পাঠ-বিবরণের মধ্যপর্যায়ে জীবন-মৃত্যুর আস্বাদ, বর্তমান-ভবিষ্যতের ফারাক আর ইচ্ছা ও সাধ্যের ব্যাপারাদি কবির কাছে, পাঠকের কাছেও নিশ্চয়, খুব মূল্যবান বস্তু হয়ে ধরা দিয়েছে। তিনি বর্তমানের সত্য ও অসহায়তাকে মেনে নিয়ে কেবল ভবিষ্যতের অনাগত অন্ধকার বা আলোর দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে থাকতেও যেন প্রস্তুত! অসুন জেনে নিই তাঁর সেই প্রস্তুতির সারকথা—'তবুও ফেরার পথ বন্ধ হয়ে গেছে একেবারে,/কায়-মনে তোমারেই চাই।/জানি স্বর্গ মিথ্যা কথা, তথাপি অলীক বিধাতারে/ রাত্রি-দিন মিনতি জানাই।/উন্মুখি হৃদয়সিন্ধু সৃজনের প্রথম প্রভাতে/ অভুঞ্জিত সুধাভাণ্ড অর্পিলাম মোহিনীর হাতে;/মৃত্যুর মাধুরী কিন্তু বাকি আছে, এসো আজ তাতে/আমাদের অমরা সাজাই।/অসাধ্যসিদ্ধির যুগ ফিরিবে না, জানি, এ-সংসারে;/তবু রুদ্ধ ভবিষ্যতে চাই ॥ (দুঃসময়: উত্তর ফাল্গুনী) ভগবানের অভাব সুধীন কবিতা দিয়ে মেটাতে চাননি; জনগণ কিংবা ইতিহাসের খেরোপাতা অনুসন্ধানের মধ্য দিয়েও নয়– তাঁর তৃষ্ণা ছিল সনাতনতার ভেতর থেকে অমৃতকে উদ্ধার করার বাসনায়। মিথ্যা দেবতাকে তিনি চিন্তা ও চেতনায় ধারণ করেননি; তবে কল্পনায় স্বর্গের অনুভবও নিতে চেয়েছেন। মর্তভূমির পাওয়া-না-পাওয়ার হিসেবের দিকে সুধীনের প্রবল আকুতি মাঝে মধ্যে আমাদেরকে তাঁর ঈশ্বরভাবনা বিষয়ে ভাবিয়ে তোলে। নিয়তিকে কি নির্মাণ অথবা পুনর্নির্মাণ কিংবা বিনির্মাণ করা যায়? অনেকে তো বলেন শুনি– নিজের হাতে নাকি ভাগ্যের চাকা ঘুরানো সম্ভব। কী জানি, কী সত্য এই পৃথিবীতে! তবু ভাগ্য মেনে কেউ করেন কাজ; আবার ভাগ্যকে নিজের কব্জায় নেবার জন্য কতজনকে যে কত কসরত করতে হয় তারও কোনো ইয়ত্তা পাওয়া যায় না। সুধীন কি ভাগ্যের নবায়ন বা নতুন রূপায়নের পক্ষে? এই প্রশ্নের চূড়ান্ত ফয়সালা মেলা ভার। তবে কি তাঁর কবিতায় আশাবাদের সুতো ধরে পানির স্বচ্ছ ধারার মতো নিচে নেমে এসেছে কপালের লিখনের জন্য দোয়াতে সাজিয়ে রাখা লাল বা সোনালি রঙের কালি! নাকি এসব সবই স্বপ্ন ও কল্পনার মিথ্যামিথ্যা খেলার জাল মাত্র! কী পাঠ পাওয়া যায় তাঁর কবিতায়? অনুসন্ধান করে দেখা যাক—

আঁধার ঘনায় চোখে, তুমি ছাড়া কেউ নেই পাশে,
অন্তরীক্ষে জমে বিভীষিকা।
লুব্ধ ভবিতব্যতারে রচ্ছ করো দৃপ্ত পরিহাসে,
হাতে হাত রাখো, সাহসিকা।
তোমার মাভৈ শুনে হয়তো বা লজ্জিত নিয়তি
ফিরাবে, অভ্যাস ভুলে, ঐকান্তিক সময়ের গতি,
মৃত্যুর বিক্ষিপ্ত জাল দিবে বুঝি মোরে অব্যাহতি,
শাপমুক্ত হবে অহমিকা;
নবজাত ভগবান বিরচিবে কৃতজ্ঞ উলাসে

আমাদের নব নীহারিকা ॥
(দুঃসময়: উত্তর ফাল্গুনী)

স্রষ্টাভাবনায় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত অধিক সচেতন ও বুদ্ধিদীপ্ত। তিনি স্রষ্টাকে অনুভব করেছেন প্রজ্ঞার আলোয়। পৃথিবীর সমস্ত অত্যাচারিত, নিপীড়িত, অবহেলিত মানবের আত্মা যখন ক্রন্দনরত, শঙ্কিত, উন্মুলিত– তখন তিনি স্রষ্টার উপস্থিতি সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেন—

ভগবান, ভগবান, রিক্ত নাম তুমি কি কেবলই?
নেই তুমি যথার্থ কি নেই?
তুমি কি সত্যই
আরণ্যিক নির্বোধের ভ্রান্ত দুঃস্বপন?
(প্রশ্ন: ক্রন্দসী)

প্রসঙ্গত, মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'প্রশ্ন' কবিতায় ঈশ্বরের ক্ষমতাশীলতা প্রসঙ্গে প্রশ্ন রেখেছেন—'যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো।/ তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছো, তুমি কি বেসেছো ভালো?' যেমন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় *পদ্মানদীর মাঝি*-তে জেলেপাড়ার ক্লিন্নতা বোঝাতে গিয়ে বলেছেন– 'ঈশ্বর থাকেন ঐ গ্রামে, ভদ্রপল্লীতে। এখানে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।' জীবনের জটিলতা, নৈরাশ্য, সমাজ বিষয়ক দ্বান্দ্বিকতা, রাজনৈতিক ধোয়াচ্ছন্নতা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মানসকে দ্বিধান্বিত করে তুলেছিল। আর ছিল ঈশ্বরের উপস্থিতি সম্পর্কে সন্দেহবোধ। এভাবেই সুধীন্দ্রনাথ কবিতায় বেশি মাত্রায় না-বোধকতার দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। অবশ্য পরে তিনি এই দর্শন থেকে কিছুটা সরে এসেছিলেন। ক্ষণিকের মুগ্ধতায় তিনি জীবনের হ্যাঁ-আতঙ্ক বোধের কাছাকাছি উপনীত হয়েছেন। এই ক্ষণিকের মুগ্ধতায় তিনি জীবনের হ্যাঁ-আতঙ্ক বোধের কাছাকাছি উপনীত হয়েছেন। এই ক্ষণবাদ তাঁর কাব্য-ভাবনায় মৃদু স্বতন্ত্র আলো প্রক্ষেপণের একটা পথ তৈরি করে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন— জীবনের নিষ্ঠুর নৈরাশ্যে শাশ্বত প্রেম-বন্ধন ক্ষণবিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়। আর তাই মুহূর্তের জন্যে প্রেমিকার শীতল সাহচর্যের মোহময়তায় চিরন্তন প্রেমের অবগাহন থেকে তিনি বিমুখ থাকতে চেয়েছেন। তাঁর ভাষায়—

মোদের ক্ষণিক প্রেম স্থান পাবে ক্ষণিকের গানে,
স্থান পাবে, হে ক্ষণিকা, শ্লথবীথি যৌবন তোমার:
বক্ষের যুগল স্বর্গে ক্ষণতরে দিলে অধিকার;
আজি আর ফিরিব না শাশ্বতের নিষ্ফল সন্ধানে।
(হৈমন্তী: অর্কেস্ট্রা)

আধুনিক অন্য সব কবির মতো সুধীনের কবিতায়ও মৃত্যু-ভাবনার পরিচয় মেলে। মূলত 'মৃত্যু চেতনাকে বাদ দিয়ে জীবন চেতনা পূর্ণতা পায় না। জীবনের সমগ্রতাকে পেতে হলে মৃত্যুকে বাদ দেয়া যায় না।'[১১] সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় তাই মৃত্যু-ভাবনা এসেছে আধুনিকতার অন্বিষ্টে। তাঁর 'বিচ্ছেদ বিধ্বস্ত হিয়া' আর 'ক্ষুব্ধ অক্ষমতা' বারে বারে শুধু 'স্বপ্নাবিষ্ট সভ্যতায় নিশ্চিন্ত'— শিয়র থেকে রূপ-স্পর্শময় জাগতিকতার বাইরে কোনো এক অজানা অন্ধকার দৃষ্টি মেলে ধরেছে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত মূলত আধুনিক কাব্যসভায় 'নিঃসঙ্গ জরার আর্তি ভোলার' কবি। নেতিবাদ থেকে অস্তিবাদে মুখ ফেরাবার কবি। অভিজ্ঞতার গভীরতাকে কাব্যভাষায় নির্মাণ করতে চেয়েছেন তিনি। তাঁর স্বাতন্ত্র্য তাই ভাষা প্রয়োগের

প্রকৌশলে, দ্বান্দ্বিকতা চিত্রণে আর সমূহ জটিলতার ভিতরে থেকে যাপিত জীবনকে দেখে নেবার প্রত্যয়ে।

তথ্যসূচি:

---

১. দীপ্তি ত্রিপাঠী, *আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়*, পঞ্চম সংস্করণ জুন ১৯৯২, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৯

২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৪

৩. সৈকত আসগর, *আধুনিক বাংলা কবিতা: শিল্পরূপ বিচার*, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, পৃ. ৮১

৪. মুহম্মদ আবদুল হাই, সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, অষ্টম সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭, ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, পৃ. ৩১৩

৫. সৈয়দ আলী আহসান, *আধুনিক বাংলা কবিতা: শব্দের অনুষঙ্গে*, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ১৯৭০, ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, পৃ. ১৪০

৬. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, 'ভূমিকা' *সংবর্ত*, ১৯৫৩, পৃ. ১০

৭. বুদ্ধদেব বসু, *প্রবন্ধ সংকলন* পৃ. ১২৪

৮. সৈকত আসগর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩

৯. ফজলুল হক সৈকত, *তিরিশোত্তর কাব্যধারা ও আহসান হাবীবের কবিতা*, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০২, ঢাকা, কল্লোল বুক সেন্টার, পৃ. ৩০

১০. আবদুল মান্নান সৈয়দ, 'জীবনানন্দ দাশ: অসংকলিত কবিতার ভূমিকা', *বাংলা একাডেমি পত্রিকা*, বৈশাখ-আশ্বিন সংখ্যা ১৩৮০, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, পৃ. ৭৮

১১. মোস্তফা আলী, *ভিন্ন প্রেক্ষিতে মানিক ও জীবনানন্দ দাশ*, প্রথম প্রকাশ ১৯৯১, বগুড়া, ঋত্বিক, পৃ. ১